# 'মহেশ' গল্পের আলোচনা

শরৎচন্দ্রের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি 'মহেশ' গল্পকে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নিয়ে আসতে হয়। গল্পটি হরিলক্ষী নামক গল্প সংকলন ১৩২৯ খ্রিঃ বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণাদীপ্ত বাঙালি কৃষকের প্রতিনিধি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গফুর মিঞা। যদিও গল্পের আসল নায়ক 'মহেশ' যাকে নিয়ে আবর্তিত জমিদারী শোষণ ও প্রজার জীবন যন্ত্রণার গভীর ট্রাজেডি। যে ট্রাজেডির সঙ্গে ২৪ পরগনার কৃষক জীবনের ট্রাজেডির আত্মিক মিল পরিলক্ষিত। কাশীপুর গ্রামের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের দাপটে প্রজারা তটস্থ, নিপুণ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অসামান্য দক্ষতায় নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভিমানী অথচ প্রত্যয়ী জেহাদ ঘোষণা করেছেন। 'মহেশ' গল্পে জমিদারী পীড়নের যে চিত্র পাওয়া যায় তা সুন্দরবনের লাট অঞ্চলে এবং সন্দেশখালি, ক্যানিং, সরবেড়িয়ার কাছারি বাড়ীতে জমিদারী পীড়নকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষক আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে কৃষক জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত। 'মহেশ' গল্পেও আমরা প্রত্যক্ষ করি সেই ঘাত-প্রতিঘাতের মর্মস্পর্শী প্রকাশ। একদিকে জমিদার এর শোষণের নির্মমতা, অন্যদিকে পর পর দু'বছরের অজন্মায় দিশেহারা গফুর মিঞা, পুত্রসম 'মহেশ' এর পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। তর্করত্ন ব্রাহ্মণের কাছে দু কাহন খড়ের করুণ আর্তি গফুরের। ঠাকুরের হাতের ভিজে চালের পুঁটলি দেখে 'মহেশ' এর খিদে আরো বেড়ে যায়। তর্করত্ন পাশ কাটিয়ে চলে গেলে গফুরের দু'চোখের জল টপটপ করে পড়ে, গফুর বলতে থাকে "জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দু-বছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি  বল?"[১১]

জমিদার মহেশের মুখের খাবার কেড়ে নিলেও গুফুর তার প্রিয় সন্তান মহেশকে ঘরের চালের পুরানো খড় খাইয়ে তার খিদে নিবারণের জন্য সচেষ্ট হয়। মহেশকে গফুর তার সন্তানের চাইতে বেশী ভালোবাসে নইলে মহেশের জন্যই জমিদার বাড়ীতে তাকে মুখে বুজে শত অত্যাচার সহ্য করতে হোত না। জমিদারের কাছারীতে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে, সেই শাস্তির করুণ বিয়োগান্তক পরিণতি লেখকের বর্ণনায় প্রকাশ পায়—"পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয়, বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।"[১২]

জমিদার বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর থেকে তার শরীরে তীব্র দহন হতে থাকে, মেয়ে আমিনার চিৎকার তার হুঁশ আসে, গফুর দেখে আমিনা মাটিতে পড়ে আছে আর ভাঙা কলসী দিয়ে গড়ানো জল মহেশ মরুভূমির জলের মত শুষে খাচ্ছে। দিকভ্রান্ত গফুর রাগে অন্ধ হয়ে লাঙ্গলের খোলা মাথা দিয়ে মহেশের মাথায় বার বার আঘাত করে। থরথর করে ওঠে মহেশের দেহ, চার পা ছট্‌ফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। গভীর রাতে মেয়ের হাত ধরে গফুর রওনা দেয় আগামী ভবিষ্যৎ এর দিকে। মেয়ে যাওয়ার সময় "জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতে ছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক না, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"[১৩] জমিদারী শোষণের নির্মম নিয়তি গ্রাস করে গফুরের মধ্যে। এই সমস্ত আশা স্বপ্ন শেষ হয় তাদের। মরমী কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের মর্মবেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর নাগরিক কলমে। গল্পের শেষ বিবরণ পাঠকের মনে তীব্র শিহরণ আনে, ছল ছল করে ওঠে চোখের তারা। পথের পাশে বাবলা গাছের নীচে এসে গফুর কাঁদতে কাঁদতে "নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি। তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"[১৪] গফুরের এই করুণ আর্তি, হাহাকার শুধু ঈশ্বরের কাছে নয়, আল্লার কাছে নয় সমস্ত গ্রামবাংলার শোষণ ও শাসনের ভয়ঙ্কর নির্মমতার বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ও হৃদয় বিদারক সুতীক্ষ্ণ হাহাকার যা শহর, সময় ও কাল থেকে কালে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসের বাস্তবতা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিস্থাপিত হয় সুচারুভাবে।